সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও লোক-দেবদেবী

সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও লোক-দেবদেবী

প্রকৃতিবিদদের কাছে সুন্দরবন হল বঙ্গোপসাগরের জলপথের সীমানায় অবস্থিত মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপকূলবর্তী জটিল দ্বীপপুঞ্জের সমাহার যেটি একটি রহস্যময় সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গের (ভারতের) দক্ষিণতম অংশে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমতম অংশে অবস্থিত সুন্দরবনের অরণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঘন গরান গাছের (Mangrove) জঙ্গল এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যারা এই অঞ্চলটিকে একটি স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে। সুন্দরবন হল বাংলার লোকসাহিত্যের একটি অজানা অন্ধকার কোণ যেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য এখানকার মানুষদের সবসময় বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অরণ্য দ্বারা বেষ্টিত এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা প্রতিদিন প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার জন্য খুবই সাহসী হয়, কারণ তাদের প্রধান জীবিকাগুলি হল চাষবাস করা এবং গভীর অরণ্য থেকে মধু সংগ্রহ করা। পরবর্তী জীবিকাটি খুবই বিপজ্জনক, কারণ অনেক মধু সংগ্রাহক যারা মৌল (Moule) নামে পরিচিত, গভীর অরণ্যে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে অরণ্যের বাঘ-দেবতার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এমনকি অরণ্যের চারিদিকে ঘিরে থাকা নদীও তাদের বাঁচাতে ব্যর্থ। সারাবছর ঝড়ের প্রকোপ ছাড়াও জেলেদের কুমীরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় সুন্দরবন সবসময় মানুষের মনে ভয় এবং উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। যেহেতু সূর্যালোক এই গভীর ঘন জঙ্গল ভেদ করে ভিতরে ঢুকতে পারে না তাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দিনের আলোতে হেঁটে যাওয়াও খুবই দুষ্কর। তাছাড়া গরান গাছের শ্বাসমূলগুলি মাটির নীচ থেকে উপরের দিকে উঠে আসায় এই বনভূমি দিয়ে হাঁটাচলা করা খুবই কঠিন। একটু অসাবধান হলেই শ্বাসমূলগুলি পায়ের তলা বিঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার (নরখাদক)

বহু বৎসর ধরে সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষগুলি এখানকার প্রতিকূলতা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাদের নিজেদের মনগড়া দেবদেবীর আশ্রয় নিয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরে যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে তাঁদের থেকে সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষগুলির দেবদেবীরা হলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিদিন বাস্তবের সাথে মানিয়ে চলতে চলতে তাদের মনে যে সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধ তৈরী হয়েছে তার থেকে পরিত্রাণ পেতেই এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেবদেবীর

অর্চনা শুরু করে। তাদের ধারণা যে এই সকল দেবদেবীরাই জঙ্গলে সমস্ত রকম বিপদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে এসেছে। প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ায় এখানকার প্রাণীকুলের জীবনযাত্রার ধরণও অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র, যার থেকে একটি নতুন সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছে।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য

গরান গাছের শ্বাসমূলগুলি মাটির নীচ থেকে উপরের দিকে উঠে থাকায় স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের হাঁটাচলার সময়ে পায়ে বিঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে

কুমীর, সুন্দরবনের একটি অন্যতম ভীতি প্রদানকারী জন্তু

সুন্দরবনের বিস্তৃতি (Region) :

সুন্দরবন অঞ্চলটি হুগলি নদীর পশ্চিম দিক থেকে মেঘনা, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অংশ এবং বাংলাদেশের খুলনা ও বকরগঞ্জ পর্যন্ত অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। গঙ্গা, যমুনা-ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা এই তিনটি বড় নদী ও তাদের অসংখ্য ছোট ছোট শাখা নদী ও উপনদীর পলির দ্বারা ব-দ্বীপের এই নিম্ন অংশটি তৈরী হয়েছে। এইখানকার ভূ-দৃশ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ এই তিনটি বড় নদীর মোহনা জুড়ে বিস্তৃত এবং দ্বীপগুলি ছোট ছোট খাঁড়ি ও নদী দ্বারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন।

এই অঞ্চলটির 'সুন্দরবন' নামকরণের পিছনেও অনেক মতভেদ আছে। কারো কারো মতে যেহেতু সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম তাই এই অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যেহেতু সুন্দরবনে সুন্দরী গাছের (*Heritiera fomes*)

আধিক্য বেশী, তাই এই অঞ্চলের নাম সুন্দরবন হয়েছে। এই সম্পর্কে তৃতীয় মতবাদটি হল - সুন্দর শব্দটি 'সমুদ্র' শব্দ থেকে এসেছে। এই মতবাদগুলি থেকে একটা কথা খুব সুস্পষ্ট যে 'সুন্দরবন' নামটা অনেক আধুনিক, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পুরো অঞ্চলটি 'ভাটি' (নীচু জমি) নামে পরিচিত ছিল।

সুন্দরবনের সাহিত্য এবং লোক দেবদেবী (Literature & Folk-Dieties of Sunderban) :

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সুন্দরবনের দেবদেবীদের উৎসর্গ করে বাংলা ভাষায় নিম্ব ব-দ্বীপ অঞ্চলের উপর অনেক পুঁথি লেখা হয়েছে। এই পুঁথিগুলিতে সমসাময়িক কালের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু হল সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিনিয়ত সংগ্রামের কাহিনী। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মূল স্রোত থেকে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ধর্ম বিশ্বাস সম্পূর্ণ আলাদা। এই অঞ্চলে প্রচলিত লোক ধর্মের নিজস্ব সূক্ষ্ম প্রভা সাধারণ ধর্মীয় নিয়মকানুন, রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সকল লোক দেবদেবীরা হলেন এই অঞ্চলে বসবাসকারী কাঠুরে, মধু সংগ্রাহক, মোম সংগ্রাহক, মাঝি, কৃষকদের নিজস্ব দেবদেবী। জঙ্গলের মধ্যে যখনই তারা কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখনই তারা এই সকল লোক দেবদেবীর স্মরণাপন্ন হয়। ঊনবিংশ শতকে শেষভাগ পর্যন্ত সুন্দরবনের বাসিন্দাদের আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে পরিচিতি ছিল না। সেই কারণে বন্য পশুরা যখন শিকারের সন্ধানে জনবসতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে হানা দিত তখন অনেক গ্রামবাসীই বেঘোরে প্রাণ দিত। কারণ সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার প্রজাতির বাঘেরা হল নরখাদক। এই অরণ্যে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই হিন্দু অথবা মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তবে ভারতে পর্তুগীজ এবং বৃটিশ অনুপ্রবেশের পর থেকে এখানে বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষেরাও বসবাস করতে শুরু করে। এই অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেশীর ভাগই নিম্নজাতের অন্তর্গত। হিন্দুদের মধ্যে নাপিত, কৈবর্ত্য, কাপালী, পড, কান্ডালা প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষের বাস এই সুন্দরবনে। অস্পৃশ্যতা এই অঞ্চলের মানুষের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় পবিত্রতা এবং অপবিত্রতাই হল এই অস্পৃশ্যতার প্রধান কারণ। এই অস্পৃশ্য জাতিগুলি হল কান্ডালা, জালাই, বাগদি, টিওর, ধোবা, যোগী, শুড়ি এবং কাওরা। এই অঞ্চলে কান্ডালা ও পড জাতির মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সকল জাতিগুলি প্রধান জীবিকা হল কৃষি, জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করা, মাছ ধরা ইত্যাদি।

গোসাবার পাখিরালয়ে বনবিবির প্রার্থনা স্থান

মা বনবিবি, মানুষ থেকে বাঘ সকলের মা

মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ মানুষই হলেন শেখ, যাদের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ এবং কাঠ কাটা। শেখদের মধ্যে সৈয়দ এবং পাঠানরা হল উচ্চবর্ণের মানুষ। এই অঞ্চলে

খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। অন্যান্য জীবিকার সঙ্গে যুক্ত এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জিপ্‌সি উপজাতির মানুষেরা হল - মিরসিকারি (শিকারী এবং জেলে), সাপুড়ে (সাপ ধরে এবং সাপের খেলা দেখায়), বেদে (পাখি ধরে) ইত্যাদি। সুন্দরবনে বসবাসকারী খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওঁরাও উপজাতির মানুষেরা এই অরণ্যে বসবাস করে। জীবিকা অর্জনের জন্য এই অঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের মানুষই অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র তাদের কাছে অপ্রতুল তাই তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য লোক-দেবদেবীদের স্মরণাপন্ন হয়। তাদের এই সংগ্রামের কাহিনী 'রায়মঙ্গল' ও 'বনবিবি জহুরানামা' পুঁথি দুটিতে বর্ণিত হয়েছে। এই পুঁথিগুলি সরল বাংলা ভাষায় লেখা। দেবদেবীদের প্রসন্ন করার জন্য এই পুঁথিগুলিতে লিখিত মন্ত্রগুলি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঁচালির আকারে গাওয়া হয়। এই শ্লোকগুলির দ্বারা প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে ভক্তদের নিরাপদে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লোক-দেবদেবীর অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই সকল লোক-দেবদেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - হিন্দু বাঘ-দেবতা দক্ষিণ রায় বা রায়মনি, মুসলমান সন্যাসিনী বনবিবি এবং মুসলমান সন্যাসী বড়খান গাজী।

অরণ্যের যে কোন জায়গায় বনবিবির প্রার্থনা করা হয়

দক্ষিণ রায় (Dakshin Ray) :

দক্ষিণ রায় ছিলেন যশোর জেলার ব্রহ্মনগরের রাজা মুকুরা রায়ের প্রধান সেনাপতি। তাঁর উপর মুকুরা রায়ের রাজত্বের দক্ষিণ অংশ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল। সেই কারণে দক্ষিণ রায় ভাটিশ্বর বা আঠারোটি নিম্নভূমির শাসনকর্তা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ রায় একজন ক্ষমতাশালী মানুষ ছিলেন যিনি তীর-ধনুক এবং অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে অনেক বাঘ ও কুমীর হত্যা করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হত। কখনো কখনো তিনি খালি হাতে যুদ্ধ করেও বাঘকে পরাজিত করেছিলেন। সেই কারণে আজ পর্যন্ত বাঘেদের দেবতা রূপে তাঁকে সুন্দরবনের ভারত এবং বাংলাদেশ অংশে আরাধনা করা হয়। এই বাঘ-দেবতা সাধারণত বাঘের পিঠে বসে থাকেন এবং কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই বা বন্ধু কালু রায়ও থাকেন। দক্ষিণ রায়কে শুধু বাঘ-দেবতা হিসাবেই নয়, স্বর্গের রক্ষাকর্তা হিসাবেও আরাধনা করা হয়। একটি কাহিনী অনুসারে দক্ষিণ রায় হলেন শিবের পুত্র, কারণ গণেশের মাথা যখন ধড় থেকে ছিন্ন করা হয় তখন সেইটি দক্ষিণ দিকে পড়েছিল। এই ধারণা থেকেই দক্ষিণ নামটির উৎপত্তি। তাই দক্ষিণ রায়কে গণেশ ঠাকুরের বিকল্প হিসাবে আরাধনা করা হয়।

বনবিবি (Banabibi) :

বনবিবি হলেন সুন্দরবন অরণ্যের দেবী যিনি অঞ্চলের নিবাসীদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনি হলেন একজন মুসলমান সন্যাসিনী এবং মক্কায় বসবাসকারী ইব্রাহিমের কন্যা, যিনি কৃষক সম্প্রদায়কে ভাটিশ্বরের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তার ভাই শাহ্ জঙ্গলিকে সঙ্গে নিয়ে ভাটিদেশে বসবাস করতে শুরু করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে বনবিবি বনচন্ডী নামে পরিচিত ছিলেন। আজও সুন্দরবনের বনবিবির দুই ধরণের মূর্তির দেখা মেলে, মুসলমান সম্প্রদায়ের বনদেবীর মূর্তিটি হল মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক তরুণীর সদৃশ। হিন্দুরা বনবিবিকে মাতৃমূর্তি রূপে আরাধনা করেন। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই মূর্তিটি বন্য ফুল এবং লতাপাতা দ্বারা সজ্জিত এবং বনবিবির গ্রীবাটি হল সুন্দরবনের বন্য অরণ্যের প্রধান শিকড়। বনচন্ডীকে উপসনা করার জন্য কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতিনীতি নেই। বছরের যে কোনো সময় যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ বনচন্ডীর উপাসনা করতে পারেন। অরণ্যের গভীরে প্রবেশের সময় এই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা যদি উপলব্ধি করেন যে তারা বাঘের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই বনবিবির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা অথবা তাঁর আরাধনার জন্য যে সকল ধর্মীয় রীতি প্রচলিত আছে সেইগুলি পালন করতে শুরু করেন। এইটি কথিত আছে যে মুঘল যুগ থেকে সুন্দরবনে বসবাসকারী গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বনচন্ডীকে তাদের আরাধ্য দেবী হিসাবে গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনি। তার ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বনচন্ডী বনবিবিতে পরিণত হয়েছেন।

জয়নগরে বনবিবির প্রার্থনাস্থানে মানুষের ভিড়

সুন্দরবনের স্থানীয় মানুষ বনের মধ্যে প্রবেশ করার সময় কুঁড়েঘর বানিয়ে বনবিবির আরাধনা করে।

সুন্দরবনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা সমান ভক্তি সহকারে এই দেবীর আরাধনা করেন। তারা বনবিবিকে কোন উচ্চবর্গের দেবী হিসাবে মন্দির বা মসজিদে স্থাপন করেননি। তারা মনে করেন বনবিবি হলেন তাঁদের কঠোর দুঃসময়ের সঙ্গী।

বনবিবি জহুরানামা পুঁথিটিতে দুইটি কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রথম কাহিনীটি হল ভগবান কিভাবে বনবিবি ও তাঁর ভাই শাহ্ জঙ্গলীকে বাসস্থানের খোঁজে মক্কা থেকে সুন্দরবনে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের শাসনকর্তা ছিলেন দক্ষিণ রায়, জায়গার অধিকার নেওয়ার জন্য বনবিবি দক্ষিণ রায়ের বিপক্ষে যুদ্ধে সম্মুখীন হন। কিন্তু দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণী বলেন যে একজন নারী অপর একজন নারীর সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারবে। এই কারণে নারায়ণী অস্ত্র ধারণ করেন এবং বনবিবির সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন। নারায়ণী তখন নিজেকে বনবিবির বন্ধু হিসাবে ঘোষণা করেন। বনবিবি ও দক্ষিণ রায় তখন সুন্দরবনে তাদের রাজত্ব ভাগ করে নেন।

বনবিবি জহুরানামা-র অপর কাহিনীটি হল কলিঙ্গে (উড়িষ্যা উপকূল) বসবাসকারী মাঝি ধনাইকে নিয়ে। ধনাই মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দুখেকে নিয়ে সুন্দরবনের অরণ্যে

আসেন। দুখে ছিল তার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ধনাই এবং তার সঙ্গীরা নরখালি নামে একটি জায়গায় পৌঁছায়। সেইখানে তারা নৌকার মধ্যে দিনভর নাচ গান করে এবং দুখে তাদের সঙ্গে ঢোল বাজায়। পরদিন ভোরবেলা ধনাই এবং তার সঙ্গীরা দক্ষিণ রায়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। দুখে একা নৌকায় বসে তাদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে। বাঘ-দেবতা তখন মধু সংগ্রাহকদের সঙ্গে এমন ছলনা করেন যে তাদের বনের মধ্যে কোন মৌচাক চোখে পড়ে না। মধু সংগ্রাহকরা তখন আবার তাদের নৌকায় ফিরে আসে এবং ধনাই রাতে স্বপ্নে দক্ষিণ রায়কে দেখে। সে দেখে যে সে দক্ষিণ রায়ের কাছে প্রার্থনা করছে যে সে যেন সাত নৌকা ভর্তি মধু ও মোম জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করতে পারে, নাহলে সে নিজের জীবন শেষ করে দেবে। তখন দক্ষিণ রায় তাকে স্বপ্নে অঙ্গীকার করেন যে যদি সে দুখেকে তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তবে সে প্রচুর পরিমাণে মধু ও মোম সংগ্রহ করতে পারবে। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও ধনাই দক্ষিণ রায়ের এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায় এবং পরদিন জঙ্গল থেকে প্রচুর মধু ও মোম সংগ্রহ করে। ফেরার সময় ধনাই দুখেকে নৌকা থেকে নদীতে ফেলে দেয়। দুখে অনেক কষ্টে নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছায় এবং সেখানে সে বাঘবেশী দক্ষিণ রায়ের সম্মুখীন হয়। দুখে দক্ষিণ রায়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বনবিবির প্রার্থনা শুরু করে ও সংজ্ঞা হারায়। বনবিবি তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হন এবং দুখেকে তার কোলে তুলে নেন এবং আল্লার নাম করে মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করেন ও দুখের সারা শরীরে ফুঁ দিতে থাকেন। দুখের জ্ঞান ফিরে আসে। বনবিবি তখন তার ভাই শাহ্ জঙ্গলীকে আহ্বান করেন এবং সে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়। বনবিবির আদেশে তাঁর ভাই দক্ষিণ রায়কে জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভয় পেয়ে দক্ষিণ রায় বড় খান গাজীর কাছে সাহায্যের উদ্দেশ্যে যায়। গাজী সাহেব তাঁদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন এবং বনবিবিকে অনুরোধ করেন দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। বনবিবি দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করে দেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, তিনি হলেন সুন্দরবনের এই আঠারোটি নিম্ন অঞ্চলের সকল প্রাণীকুলের মা। কেউ যদি তাঁকে মা বলে অভিবাদন করে তবে তিনি তাকে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবেন। কেউ যদি বিপদে পড়ে বনবিবিকে স্মরণ করে তাহলে দক্ষিণ রায় তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেন না। দক্ষিণ রায় তখন বনবিবিকে অঙ্গীকার করে বলেন যে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে বনবিবির স্মরণাপন্ন হবে দক্ষিণ রায় তার কোন ক্ষতি সাধন করবেন না। বনবিবি দুখেকে প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে দেশে ফিরিয়ে দেন।

কুলতলীর নোগেনাবাদে বনবিবি, শাহ্ জঙ্গলী এবং গাজী খানের প্রার্থনা স্থান

কুলতলীর বোনাই ক্যাম্পে বনবিবি দুখেকে কোলে নিয়ে আছেন, শাহ্ জঙ্গলী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে

বনবিবি বাঘের পিঠে অবস্থান করেছেন, এইখানে বাঘটি হল দক্ষিণ রায়

বড় খান গাজী (Barakhan Gazi) :

কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' পুঁথিতে বড়খান গাজীর কাহিনীর উল্লেখ আছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে তিনি হলেন মুসলমান ফকিরদের পথ প্রদর্শক। সুন্দরবনের জঙ্গল পরিস্কার করে জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলাই তার প্রধান দায়িত্ব ছিল। মুসলমান সম্প্রদায় তাকে বড় খান গাজী নামে অভিহিত করত। এই ফকির যখন সুন্দরবনে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যমে বনের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে তখন সে দক্ষিণ রায়ের সম্মুখীন হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁরা একটি আপস-মীমাংসায় আসে যে নিম্নবঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বাঘ-দেবতা দক্ষিণ রায়ের অধীনে থাকবে এবং এই অঞ্চলে সকল মানুষ গাজী পীরের সমাধিস্থলে আরাধনা করবে এবং যেখানেই ঈশ্বরের মস্তক চিহ্ন দেখবে সেখানেই তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে।

হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য উপজাতির মানুষ যারা অন্য দেশ থেকে সুন্দরবনে এসে বসবাস শুরু করেছে তারাও সমভক্তি সহকারে বনবিবি এবং গাজী সাহেবের আরাধনা করে থাকে। এই সকল স্থানীয় কাহিনীগুলি থেকে এই সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সুন্দরবনে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সুসামঞ্জস্য বজায় আছে। এই অঞ্চলের লোক দেবদেবীরা জঙ্গলে নিজেদের আধিপত্য রক্ষা করার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধুভাবপূর্ণ জমির ভাগাভাগির দ্বারা, আপস-মীমাংসার দ্বারা অথবা উচ্চবর্গের দেবতাদের হস্তক্ষেপে এই ঝগড়ার সমাধান হয়েছে। সুন্দরবনের জলাভূমি এবং অরণ্য এই অঞ্চলের সব শ্রেণীর মানুষকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছে এবং তাদের চিহ্নিত সাধারণ দেবীকে বনের অন্যান্য দেবতারাও স্বীকৃতি দিয়েছে। এইভাবেই সুন্দরবনের মানুষগুলি প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের ঘরোয়া দেবদেবীদের আশীর্বাদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করে জীবন অতিবাহিত করছে।

মথুরাপুর মসজিদে গাজী বাবা

সুন্দরবনের মানচিত্র

Prepared by :
Dr. Sutapa Chatterjee Sarkar
Professor, Department of History
West Bengal State University

Translated by :
Dr. Anindita Saha
Research Associate, University of Sussex
United Kingdom

Funded by :

Art & Humanities Research Council, United Kingdom

Organised by :

Centre for World Environmental History, University of Sussex

Royal Botanic Gardens, KEW

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

Botanical Survey of India

Indian Museum, Kolkata